পেঁয়াজের উৎপাদন-ঘাটতি নিরসনে সম্ভাবনাময় গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION
Together for Better Life

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

IFAD
Investing in rural people

পেঁয়াজের উৎপাদন-ঘাটতি নিরসনে সম্ভাবনাময় গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION
Together for Better Life

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

IFAD
Investing in rural people

উপদেষ্টা

ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম
সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও
প্রকল্প সমন্বয়কারী, PACE প্রকল্প, পিকেএসএফ

মহসিন আলী
নির্বাহী পরিচালক
ওয়েভ ফাউন্ডেশন

তত্ত্বাবধান

আনোয়ার হোসেন
উপ-নির্বাহী পরিচালক
ওয়েভ ফাউন্ডেশন

তথ্য ও গ্রন্থনা

মোঃ মাসুম সরকার
ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট ম্যানেজার
PACE প্রকল্প, পিকেএসএফ

নুরে আলম মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক
কৃষি বৈচিত্র্য ও ভ্যালু চেইন প্রকল্প
ওয়েভ ফাউন্ডেশন

ফায়সাল মাহমুদ জোয়ার্দার
ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর
ওয়েভ ফাউন্ডেশন

গ্রাফিক ডিজাইন ও লেআউট

কমিউনিকেশনস্ এন্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন
ওয়েভ ফাউন্ডেশন

প্রকাশক

ওয়েভ ফাউন্ডেশন

মুদ্রণে

পাথওয়ে

প্রকাশকাল

জুলাই ২০২২

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.০	ভূমিকা	১
২.০	পেঁয়াজের বহুবিধ ব্যবহার	১
৩.০	পেঁয়াজ উৎপাদনকারী প্রধান দেশসমূহ	১
৪.০	বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধি	১
৫.০	বাংলাদেশে পেঁয়াজের সার্বিক পরিস্থিতি	২
৫.১	উৎপাদন পরিস্থিতি	২
৫.২	পেঁয়াজ উৎপাদনের সময়কাল	২
৫.৩	পেঁয়াজ চাষে ব্যয়	৩
৫.৪	পেঁয়াজের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত ভ্যালু চেইন কর্মকান্ড	৪
৫.৫	পেঁয়াজে মূল্য সংযোজন ব্যবস্থা	৪
৫.৬	বাংলাদেশে পেঁয়াজের জাত	৫
৫.৭	বাংলাদেশে পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণ	৫
৫.৮	মোট উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং ঘাটতির পরিমাণ	৬
৫.৯	দর ওঠানামা ও আমদানি নির্ভরতার পরিণতি	৭
৫.১০	ঘাটতিজনিত অবস্থায় অভিজ্ঞতার আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা	৭
৫.১১	উৎপাদন বৃদ্ধিতে দেশীয় কৃষকের ক্ষতি	৭
৬.০	বিদ্যমান সমস্যা মোকাবেলা	৮
৬.১	সারা বছরব্যাপী পেঁয়াজ চাষ	৮
৬.২	গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ সম্প্রসারণ সম্ভাবনা	৯
৬.৩	পোঁয়াজের বীজ সংরক্ষণের জন্য কোল্ড রুম স্থাপন	৯
৬.৪	বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ	১০
৭.০	মাঠ পর্যায়ে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে পিকেএসএফ এর অভিজ্ঞতা	১১
৭.১	শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের উৎপাদনশীলতার তুলনামূলক চিত্র	১২
৭.২	গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের খরিপ-১ ও খরিপ-২ এর উৎপাদনশীলতার তুলনামূলক চিত্র	১৩
৭.৩	গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ	১৩
৭.৪	পেঁয়াজ সংগ্রহোত্তর ওজন হ্রাস নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা	১৪
৮.০	বছরব্যাপী পেঁয়াজ চাষ সম্প্রসারণে পিকেএসএফ এর যুগান্তকারী অবদান	১৫
৯.০	সুপারিশসমূহ	১৯
১০.০	উপসংহার	২১

১. ভূমিকা:

পেঁয়াজ, যার বৈজ্ঞানিক নাম *Allium cepa*, যা একটি দ্রুত পঁচনশীল কন্দসদৃশ রসালো জাতীয় কৃষিপণ্য যা অতি প্রাচীনকাল থেকেই সারা বিশ্বের সকল মানুষের মসলা জাতীয় ভোগ্যপণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যদিও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থে রোগ নিরাময়ক ভেষজ হিসাবেও পেঁয়াজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, লেখা আবিষ্কার ও চাষাবাদ প্রক্রিয়া শুরুর বহু আগে থেকেই আমাদের আদি পুরুষগণ বুনো পেঁয়াজকে খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছিলেন। অনেক গবেষকদের মতে প্রায় ৫০০০ বছর পূর্ব থেকেই মানুষ পেঁয়াজের চাষাবাদ শুরু করে।

২. পেঁয়াজের বহুবিধ ব্যবহার:

পেঁয়াজ ১২টি প্রজাতিতে বিভক্ত যার অধিকাংশই সবজি, মসলা ও ঔষধি পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণত: তিন রংয়ের পেঁয়াজ বাজারে দেখতে পাওয়া যায়; হলদে-বাদামী, লাল ও সাদা। অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদান ছাড়াও বিভিন্ন দেশে পেঁয়াজের নানাবিধ ব্যবহার সম্পর্কে জানা যায়, যেমন-রান্নার কাজে মসলা হিসাবে ও সালাদ হিসাবে, ধর্মীয় কাজে, রোগ নিরাময়কারক ভেষজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও প্রাচীনকালে মিশরীয়রা মমি সংরক্ষণে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে পেঁয়াজ ব্যবহার করতো বলে জানা যায়।

৩. পেঁয়াজ উৎপাদকারী প্রধান দেশসমূহ:

খাদ্য হিসাবে বিশ্বের সব দেশের সকল মানুষের কাছেই পেঁয়াজ ব্যাপকভাবে সমাদৃত। FAO এর মতে সামগ্রিক উৎপাদনের পরিমাণের হিসাবে বর্তমান বিশ্বের প্রধান ১৫টি সবজি জাতীয় পণ্যের মধ্যে পেঁয়াজের অবস্থান দ্বিতীয়, অথচ কয়েক বছর পূর্বে যার অবস্থান ছিলো ষষ্ঠ। বিশ্বের ১৭০টিরও বেশি দেশে পারিবারিক প্রয়োজনে ও বাণিজ্যিকভাবে পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উৎপাদিত দেশসমূহের মধ্যে চীন, ভারত, মিশর, যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, তুরস্ক, রাশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ব্রাজিল, নেদারল্যান্ডস, নাইজেরিয়া, মেক্সিকো, সুদান, দক্ষিণ কোরিয়া, স্পেন, ইন্দোনেশিয়া, আলজেরিয়া, ইউক্রেন, মায়ানমার, জাপান ও উজবেকিস্তান অন্যতম।

বিশ্বের মোট উৎপাদনে চীন (২৫ শতাংশ) ও ভারত (২৩ শতাংশ) প্রায় অর্ধেক জোগান দিয়ে থাকে। সারা বিশ্বে প্রায় ২২ লক্ষ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজের চাষ হয় এবং বছরে পেঁয়াজ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২২.৮৪ বিলিয়ন মে. টন (সূত্র: TRIDGE)। এর মধ্যে চীনে সর্বাধিক পেঁয়াজ উৎপাদন হয় ২৪,৯০৮,৩৯২ টন। দ্বিতীয় পেঁয়াজ উৎপাদনকারী দেশ ভারতে প্রতি বছর উৎপাদন প্রায় ২২,৪১৯,০০০ টন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, মিশর, পাকিস্তান, তুরস্ক, ইরান, ব্রাজিল, রাশিয়া ও কোরিয়া বিশ্বের প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদনকারী দেশ।

পেঁয়াজ উৎপাদনে চীন ও ভারত-এর পর পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, তুরস্ক, পাকিস্তান, সুদান, ইরান ও রাশিয়ার অবস্থান। বর্তমানে বিশ্বে পেঁয়াজ উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। অঞ্চল ভিত্তিক বিবেচনায় বিশ্বের ১৭০টি দেশের মোট উৎপাদিত পেঁয়াজের বেশিরভাগ উৎপাদিত হয় এশিয়া মহাদেশে, যা বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৬০ ভাগেরও বেশি।

৪. বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধি:

১৯৯৬ সালে সারা বিশ্বে মোট পেঁয়াজ উৎপাদিত হয় মোট ৪০,৬৯৫,৮৪৮ মেট্রিক টন এবং মোট চাষকৃত জমির পরিমাণ ছিলো ২৪,৬০,৫৩২ হেক্টর। বিশ বছর ব্যবধানে ২০১৬ সালে মোট উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় মোট ৯৩,২২৬,৪০০ মেট্রিক টন এবং মোট পেঁয়াজ চাষকৃত জমির পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৪৯,৫৫,৪৩২ হেক্টর, যা বিগত দিনের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশে প্রায় ১২ লক্ষ কৃষক পেঁয়াজ চাষে জড়িত যারা প্রতি বছর ২.৫৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ করে থাকে।

৫. বাংলাদেশে পেঁয়াজের সার্বিক পরিস্থিতি:

৫.১. উৎপাদন পরিস্থিতি:

বাংলাদেশে পেঁয়াজ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মসলা ও সবজি জাতীয় বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য। দেশের প্রতিটি পরিবারে পেঁয়াজ একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য যা বহুবিধভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পারিবারিকভাবে পেঁয়াজ মূলতঃ মসলা ও সালাদ হিসাবেই বেশি ব্যবহার করা হয়। চাটনি ও আচার হিসাবেও পেঁয়াজ ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি চিকিৎসায় রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, মূত্রবর্ধক ও ব্যাথা নিরাময়ের কাজে পেঁয়াজ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পেঁয়াজের কন্দ ও পাতা ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও সালফার নামক খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ। পেঁয়াজের চাষ পারিবারিক আয়বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত লাভজনক। পরিমাণের দিক থেকে সকল মসলা জাতীয় পণ্যের মধ্যে পেঁয়াজের চাহিদা সবচেয়ে বেশি এবং উৎপাদনও হয় বেশি।

বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া সারা বছর পেঁয়াজ চাষের অনুকূল এবং লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও সরকারি কারিগরি সহযোগিতা, উদ্দীপনা, প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও বাজারজাতকরণ সুবিধার অভাব, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদনের কারিগরি সহায়তা ও বীজের অপ্রতুলতার কারণে বাংলাদেশে পেঁয়াজ প্রধানত: শীতকালে চাষ করা হয়।

পারিবারিক চাহিদা মেটাতে সারাদেশেই কমবেশি পেঁয়াজের আবাদ করা হয়ে থাকে তবে বাণিজ্যিভাবে বাৎসরিক মোট পেঁয়াজ উৎপাদনের প্রায় অর্ধেকই উৎপাদিত হয় ফরিদপুর, পাবনা ও রাজবাড়ি জেলায়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর তথ্য অনুযায়ি ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৪৮% উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১-২০১২ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ১০ বছরে পেঁয়াজ উৎপাদিত জমির পরিমাণ ৪১% বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষকবান্ধব যথাযথ সরকারি নীতিমালা, উৎপাদন পরিকল্পনা ও বাজার ব্যবস্থাপনার অভাবে দামের দিক থেকে কৃষকদের লাভ হয়নি বরং উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিবরণ	জমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদনের পরিমাণ (লক্ষ মে. টন)
২০১৫-২০১৬	২.১৬	২১.৩০
২০১৬-২০১৭	২.১৩	২১.৫৩
২০১৭-২০১৮	২.১২	২৩.৩০
২০১৮-২০১৯	২.০৮	২৩.৩১
২০১৯-২০২০	২.৩৮	২৫.৬১
২০২০-২০২১	২.৫৩	৩৩.৬২

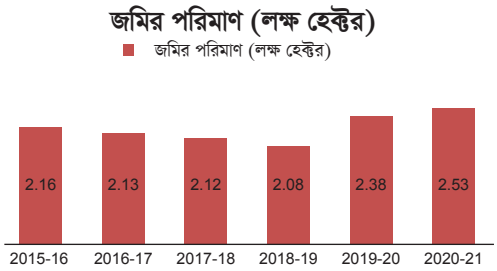

চিত্রঃ পেঁয়াজ উৎপাদিত জমি বৃদ্ধির রেখা চিত্র

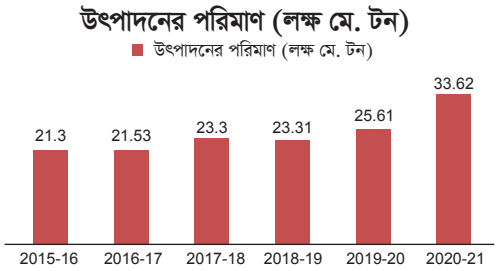

চিত্রঃ পেঁয়াজ ফলন বৃদ্ধির রেখা চিত্র

৫.২. পেঁয়াজ উৎপাদনের সময়কাল:

বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে অন্যান্য প্রতিযোগী সবজি ও মসলা জাতীয় পণ্যের মধ্যে পেঁয়াজ চাষ অত্যন্ত লাভজনক। বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে পেঁয়াজ একটি অত্যাবশ্যকীয় দৈনন্দিন পণ্য বিধায় এর চাহিদা থাকে সারা বছর এবং সমহারে। তাই, সরবরাহ ঘাটতি দেখা দিলে এর দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। তাই বাণিজ্যিকভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে ও উন্নত জাতের পেঁয়াজ চাষ করে ফলন বৃদ্ধি করে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে পেঁয়াজ বিদেশেও রপ্তানী করা সম্ভব।

সাধারণত: সেচ ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত বেলে দোঁ-আশ বা পলিযুক্ত মাটি পেঁয়াজ চাষের জন্য উত্তম। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও বেশিরভাগ অঞ্চলের মাটি সারা বছর পেঁয়াজ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। বর্তমানে বাংলাদেশে পেঁয়াজ মূলত এক ফসলী এবং এর চাষ শুধুমাত্র শীত মৌসুমে সীমাবদ্ধ। এলাকাভেদে চাষিরা কম-বেশি অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধের মধ্যে পেঁয়াজের বীজ বপন করে এবং মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যেই ফসল তুলে বাজারজাত করে থাকেন। এই শীতকালীন পেঁয়াজ উৎপাদনের পরিমাণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী ৬-৭ মাসের দেশীয় বাজার চাহিদা মেটাতে পারে অর্থাৎ সাধারণত: সেপ্টেম্বর - অক্টোবর পর্যন্ত বাজারে পাওয়া যায়। পরবর্তী ৬ মাস (আনুমানিক সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী বছরের মার্চ - এপ্রিল পর্যন্ত অর্থাৎ নতুন পেঁয়াজ না আসা পর্যন্ত) বাজারে পেঁয়াজের ঘাটতি দেখা দেয়। এই সময়েই সাধারনতঃ আমদানি করা পেঁয়াজ দিয়ে বাজারের চাহিদা মেটানো হয়ে থাকে। শীতকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন ও ফসল তোলার সময়কাল নিম্নে প্রদর্শন করা হলো। এলাকাভেদে এই সময়কাল ভিন্ন হয়।

ছক-১:

মৌসুম	জাত	সময়কাল	ফসল সংগ্রহ	বাজারে পাওয়া যায়	ঘাটতির সময়কাল
শীতকালীন রবি শস্য	বারি–৪ (সুখসাগর), বারি-১ (তাহিরপুরী)	মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর	মার্চ - মে সময়কালে	সেপ্টেম্বর – অক্টোবর পর্যন্ত	নভেম্বর থেকে পরবর্তী বছরের এপ্রিল পর্যন্ত ৬ মাস সময়কাল

৫.৩. পেঁয়াজ চাষে ব্যয়:

বীজ বপন থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত পেঁয়াজ উৎপাদনের সময়কাল বেশ দীর্ঘ যা স্থানভেদে ১২৫ থেকে ১৪০ দিন বা ৪ থেকে সাড়ে ৪ মাস এবং ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে বেশি। ফসল উৎপাদনে ব্যয় হয় মূলত: বীজ শোধন থেকে শুরু করে বীজতলা তৈরি, চারা রোপন, সেচ, পরিচর্যা, সার ও কীটনাশক বাবদ। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, প্রতি বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষে গড়ে খরচ হয় প্রায় ৩৩-৩৫ হাজার টাকা। এর মধ্যে বীজ বাবদ খরচ হয় প্রায় ৩৫-৪০% এবং শ্রমিকদের জন্য খরচ হয় প্রায় ২৪%।

পেঁয়াজ ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনের ব্যয়: মাঠ পর্যায়ের তথ্য অনুযায়ী: (১ বিঘা = ৩৩ শতক হিসাবে)

বিভিন্ন অবস্থায় উৎপাদন ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট ব্যয়	পেঁয়াজের জাত		
	দেশি জাত (বারি-১,৩)	উফশী জাত (বারি-৪)	গ্রীষ্মকালীন জাত (বারি-৫)
১ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ উৎপাদন ব্যয়	৩০,০০০/- টাকা	৩৭,৫০০/- টাকা	৩০,০০০/- টাকা
১ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ উৎপাদন	২,০০০ কেজি	৬,৪০০ কেজি	৪,০০০ কেজি
প্রতি কেজি পেঁয়াজ উৎপাদন ব্যয়	১৫/- টাকা	৬/- টাকা	৭.৫/- টাকা
১ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন ব্যয়	৯৫,০০০/- টাকা	১৪২,০০০/- টাকা	১২৫,০০০/- টাকা
১ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন	৬০ কেজি	১২০ কেজি	১০০ কেজি
প্রতি কেজি পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন ব্যয়	১,৫৮৩/- টাকা	১,১৮৩/- টাকা	১,২৫০/- টাকা

পেঁয়াজের ও পেঁয়াজের বীজের বাজারমূল্য পরিবর্তনশীল। ২০২০ সালে প্রতি কেজি পেঁয়াজের বীজ ১২,০০০/- টাকারও অধিক মূল্যে বিক্রি হয়েছে, যা ২০২১ সালে ৮,০০০ টাকায় এবং ২০১৯ সালে ২,০০০ টাকায় বিক্রি হয়েছিল।

৫.৪. পেঁয়াজের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড:

পেঁয়াজের সাপ্লাই চেইনের অভিন্ন কোন কাঠামো নেই যা দেশজুড়ে সমস্ত অঞ্চল বা এলাকার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এলাকাভেদে এর ভিন্নতা লক্ষণীয়। আবার একই এলাকায় বিভিন্ন ধরনের সাপ্লাই চেইনের উপস্থিতিও লক্ষণীয়। তবে পেঁয়াজের সাপ্লাই চেইনের মধ্যে সক্রিয় এ্যাক্টরদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য তারা হলেন, উপকরণ সরবরাহ ও সেবাদানকারী, উদ্যোক্তা কৃষক, স্থানীয় ব্যবসায়ী (পাইকার, বেপারী, ফড়িয়া, কমিশন এজেন্ট), বড় ব্যবসায়ী (জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের পাইকারী বিক্রেতা ও আড়তদার), আমদানিকারক, খুচরা বিক্রেতা (সব পর্যায়ের যেমন: উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয়) এবং ক্রেতা বা ভোক্তা। যেহেতু, বাজার চাহিদার একটি বড় অংশ আমদানির মাধ্যমে মেটানো হয়ে থাকে সেহেতু, পেঁয়াজের সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ শৃঙ্খলে আমদানিকারকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষণীয়। কমিশন এজেন্টদের মাধ্যমে আমদানিকারকগণ দেশের বড় বড় বাজারের আড়তদার/ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। বাজারের সরবরাহ ও দাম নির্ধারণে মূলত: তারাই মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া মৌসুমে পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য স্বল্পমূল্যের সংরক্ষণাগার প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়টি বিবেচ্য।

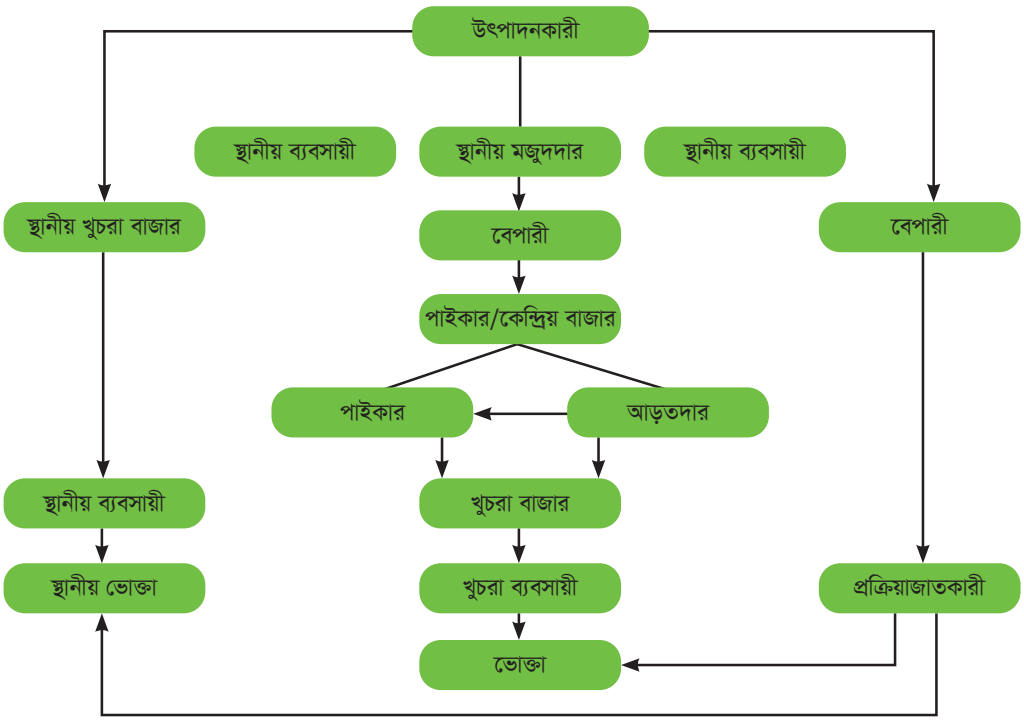

চিত্র: বিদ্যমান পেঁয়াজের মার্কেটিং চ্যানেল

৫.৫ পেঁয়াজে মূল্য সংযোজন ব্যবস্থা:

পেঁয়াজের সাপ্লাই চেইনে মূল্য সংযোজনের পরিমাণও সব সময় এক থাকে না। প্রতি মণ (৪০ কেজি) পেঁয়াজের আনুমানিক উৎপাদন খরচ ৮৭০ টাকা। কৃষকগণ নিকটস্থ বাজারে প্রতি মণ পেঁয়াজ বিক্রি করেন গড়ে ১,০৯০ টাকা। ফলে প্রতিমণ পেঁয়াজে লাভের পরিমাণ ছিলো ২২০ টাকা অর্থাৎ প্রতি কেজি পেঁয়াজে ৫.৫০ টাকা। প্রতি মণ পেঁয়াজের বাজারজাতকরণ ব্যয় (শ্রমিক, ভ্যান ভাড়া ইত্যাদি) ২৫ টাকা। ফলে, প্রতি মণ পেঁয়াজে নিট লাভ ১৯৫ টাকা বা প্রতি কেজিতে ৪.৮৮ টাকা।

ছক-২:

উৎপাদন খরচ (৪০ কেজি)	বাজার মূল্য (৪০ কেজি)	মোট লাভ (৪০ কেজি)	মোট লাভ (প্রতি কেজি)	বিপণন খরচ (৪০ কেজি)	নিট লাভ (৪০ কেজি)
৮৭০ টাকা	১,০৯০ টাকা	২২০ টাকা	৫.৫ টাকা	২৫ টাকা	১৯৫ টাকা

ছক-৩: সাপ্লাই চেইনে পেঁয়াজ মার্কেট এক্টরদের প্রাপ্ত মুনাফার শতকরা হার

মার্কেট এ্যাক্টর	কৃষক	ফড়িয়া	বেপারী	আড়তদার	পাইকার	খুচরা বিক্রেতা	সর্বমোট
ভোগকৃত মুনাফা	৪২.৫১%	১৪.১৭%	৫.৪১%	৩.৮২%	৯.৭২%	২৪.৩৭%	১০০%

৫.৬. বাংলাদেশে পেঁয়াজের জাত:

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) দেশের আবহাওয়া উপযোগী উচ্চ ফলনশীল পেঁয়াজের ৫টি জাতের উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে দুটি জাত বারি-১ ও বারি-৪ রবি মৌসুম বা শীতকালে চাষের উপযোগী। বাংলাদেশের কৃষকরা সাধারণত: শীতকালীন বা রবি মৌসুমে বারি-৪ জাতের পেঁয়াজ (যা স্থানীয়ভাবে 'সুখসাগর' নামে পরিচিত) ব্যাপকভাবে চাষ করে থাকে। অন্য ৩টি জাত বারি-২, বারি-৩ ও বারি-৫ খরিপ বা গ্রীষ্ম মৌসুম উপযোগী যা বৃষ্টি ও খরা সহনীয়। বিগত কয়েক বছর যাবত দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের মাধ্যমে এসব জাতের পেঁয়াজ চাষ সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যার মধ্যে আবার বারি পেঁয়াজ-৫ এর গ্রহণযোগ্যতা বেশি। ফলে বাংলাদেশে সারা বছর পেঁয়াজ চাষ করার মাধ্যমে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ঘাটতি মোকাবেলাই নয় বরং দেশের ঘাটতি পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

বারি পেঁয়াজ-১

বারি পেঁয়াজ-২

বারি পেঁয়াজ-৩

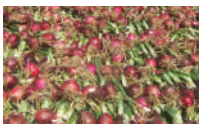
বারি পেঁয়াজ-৪

বারি পেঁয়াজ-৫

৫.৭. বাংলাদেশের পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণ:

দেশে গত এক দশকে পেঁয়াজের উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে তবে বাজার নিয়ন্ত্রণকারী আমদানিকারকগণ এবং তাদের সহযোগী ব্যবসায়ীরা দেশীয় পেঁয়াজ উৎপাদনকারী কৃষক ও এর ভোক্তাদের বঞ্চিত করে নিজেরা লাভবান হচ্ছেন। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত পেঁয়াজের দাম সাধারণতঃ ঢাকা শ্যামবাজারের, চিটাগাং খাতুনগঞ্জের ও যশোরের বেনাপোলের বড় বড় আমদানিকারক, পাইকার ও আড়তদাররাই নির্ধারণ করে থাকেন। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে দামের উত্থান-পতন, অভ্যন্তরীণ বাজারে পেঁয়াজের ঘাটতি স্থানীয় বাজারকে প্রভাবিত করে থাকে। দেশীয় পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে সাধারণতঃ পাবনা, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া অঞ্চলের বড় বড় ব্যবসায়ীদের মূখ্য ভূমিকা থাকে। পেঁয়াজ আমদানিতে স্থানীয় আমদানিকারকদের নিকট প্রতিবেশী দেশ ভারতই অন্যতম উৎস এবং মোট দেশজ প্রয়োজনের ৮০ ভাগ পেঁয়াজই ভারত থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও তুরস্ক, মিশর, মায়ানমার ও পাকিস্তান থেকেও পেঁয়াজ আমদানি করা হয়ে থাকে। যেহেতু বাংলাদেশের পেঁয়াজের ঘাটতির একটা বড় অংশ প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে পূরণ হয়, সেহেতু ভারতীয় বাজারে দামের উত্থান-পতন বাংলাদেশের বাজারকে সরাসরি প্রভাবিত করে। যদিও ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পেঁয়াজ উৎপাদনকারী দেশ তবুও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সে দেশের উৎপাদন ও সরবরাহেও ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

চিত্র: মেহেরপুর জেলায় উৎপাদিত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ

ভারত সরকার পেঁয়াজ রপ্তানির উপর মাঝে মাঝে বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকে। যেমনটা ঘটেছিলো ২০১৯ সালে। অতিরিক্ত বর্ষার কারণে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যহত হওয়ায় এবং স্থানীয় বাজারে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ভারত সরকার রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। যার প্রভাবে বাংলাদেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ২৫০ টাকা পর্যন্ত উঠে যাওয়ার উদাহরণ আছে। সাধারণভাবে পেঁয়াজের দাম প্রতি কেজি ৩০-৪০ টাকা থাকে।

৫.৮ মোট উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং ঘাটতির পরিমাণ:

বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের মোট বাৎসরিক উৎপাদন, চাহিদা ও আমদানির পরিমানের নির্ভরযোগ্য তথ্যের বড়ই অভাব। তবে মসলা গবেষণা কেন্দ্রের তথ্য মতে বাংলাদেশে বছরে পেঁয়াজের বাৎসরিক চাহিদা প্রায় ২৬.২৫ লক্ষ মে.টন। চাহিদার বিপরীতে ডিএই'র তথ্যানুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পেঁয়াজের উৎপাদন হয় ৩৩.৬২ লক্ষ মে.টন। মোট উৎপাদিত পেঁয়াজ সংগ্রহোত্তর ক্ষতি ২৫-৩০% বাদ দিলে নীট উৎপাদন প্রায় ২৩.৫৩ লক্ষ মে.টন। ঘাটতি থাকছে প্রায় ৩ লক্ষ মে.টন। এই ঘাটতি পূরণ করতে ও পেঁয়াজের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে পেঁয়াজ আমদানি করে চাহিদা মেটানো হয়। (সূত্র: ঢাকা ট্রিবিউন, ২৬-০৫-২০২১)

২.৭: ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের তুলনা

বিবরণ	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
মোট উৎপাদনের পরিমাণ (লক্ষ মে.টন)	২৫.৬১	৩৩.৬২
উৎপাদন কন্দ পেঁয়াজ (মুড়িকাটা) (লক্ষ মে.টন)	৪.৬৮	৮.২১
উৎপাদন চারা পেঁয়াজ (হালি) (লক্ষ মে.টন)	২০.৯৩	২৫.৪১
আবাদকৃত জমি (লক্ষ হেক্টর)	২.৩৮	২.৫৩
গড় ফলন (লক্ষ মে.টন) হেক্টর প্রতি	১০.৭৬	১৩.২৭
নীট বাৎসরিক ফলন	১৭.৯৩	২৩.৫৩
আমদানি (লক্ষ মে.টন)	৫.৭১	৫.৫২
বাৎসরিক চাহিদা (লক্ষ মে.টন)	-২৬.২৫	-২৬.২৫

৫.৯. দর ওঠানামা ও আমদানি নির্ভরতার পরিণতি:

সাধারণতঃ পেঁয়াজের চাহিদার পরিমাণ বছরে সবসময়ই মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে যার পরিমাণ প্রতি মাসে প্রায় ২ লক্ষ মে: টন। দামও সময়ভেদে মোটামুটি কেজি প্রতি ২৫ টাকা থেকে ৪০ টাকার মধ্যেই উঠানামা করে। যদিও দুই ঈদের সময়ে তা কিছুটা বাড়ে। সরবরাহে ঘাটতির অজুহাতে ঐ সময়ে ব্যবসায়ীরা প্রায় ২০-২৫% দাম বাড়িয়ে থাকে যা সাময়িক এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আবার তা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২৫০ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি হয় বিগত বছরের (২০১৯ সালের) শেষ সময়ে। ২০১৩-২০১৪ সালে প্রধান আমদানিকারক দেশ ভারতে বন্যার করণে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় তখনও বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পায়; ফলে আমাদের দেশেও পেঁয়াজের মূল্য বেড়ে যায়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ভারতে বন্যা, ঘুর্ণিঝড়ের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয়ায় দেশীয় পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পায়। বিগত ৫ বছরের খুচরা মূল্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে পেঁয়াজের সর্বোচ্চ মূল্য ছিল ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে ২৫০ টাকা এবং সর্বনিম্ন মূল্য ছিল ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ২১ টাকা। ২০১৬ সালে মূল্য স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। ২০১৭ সালে আগষ্ট হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত উর্দ্ধগতি ছিল। এই উর্দ্ধগতি পরবর্তী বছর ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ২০১৮ সালে পেঁয়াজের ভরা মৌসুমেও দাম অস্বাভাবিক ছিল। তবে ডিসেম্বর, ২০১৮ মাসে দাম অনেকটাই কমে যায় যা পরবর্তী ২০১৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। জুলাই, ২০১৯ মাস থেকে মূল্য উর্দ্ধগতি লক্ষ্য করা যায় যা, নভেম্বর মাসে সর্বোচ্চ ২৫০ টাকায় দাঁড়ায়। এই উচ্চ মূল্য ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মার্চ, ২০২০ হতে আগস্ট, ২০২০ মাসে মূল্য স্থিতি থাকলেও সেপ্টেম্বর, ২০২০ মাস থেকে উর্দ্ধগতি লক্ষ্য করা যায়। এই মূল্য সংকটের অন্যতম কারণ "আকস্মিক যোগান সংকট"। তাছাড়াও, বাজার বিশ্লেষকদের মতে মূলতঃ দুটি কারণে পেঁয়াজের এই সর্বোচ্চ দাম বৃদ্ধি ঘটে। প্রথমতঃ ২০১৭-২০১৮ সালে পেঁয়াজ চাষীরা ব্যাপক দরপতনের কারণে ৭/৮ টাকা কেজি দরে তাদের পেঁয়াজ বিক্রি করতে বাধ্য হয়ে আর্থিক ক্ষতির শিকার হয় এবং হতাশার কারণে ২০১৮ - ২০১৯ সালে পেঁয়াজের উৎপাদন কমিয়ে দেয়। ফলে বাজারে এমনিতেই ঐ বছর সরবরাহে ঘাটতি ছিলো। বছরের শেষ সময়ে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাস থেকে বাজারে দেশীয় পেঁয়াজের ঘাটতি শুরু হয় যা পরবর্তি ফসল বাজারে না আসা পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ফলে ঐ সময়কালে আমদানিকৃত পেঁয়াজে (প্রধাণত: ভারত থেকে) বাজার ব্যবস্থা চালু রাখা হয়।

৫.১০. ঘাটতিজনিত অবস্থায় অভিজ্ঞতার আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা:

গত বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি রোধে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ গত শীত মৌসুমে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করে। কৃষকদেরকে বেশি বেশি পেঁয়াজ চাষে উৎসাহিত করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গত বছর (২০২০-২১ অর্থ বছর) বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ এবং বীজ উৎপাদন বিষয়ে পরামর্শ ও মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও উৎপাদন বৃদ্ধির চাষীদেরকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করছে বলে মাঠ পর্যায় থেকে জানা যায়। বাজারে পেঁয়াজের আকাশচুম্বী দাম দেখে কৃষকরাও বেশি লাভের আশায় চাষের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় পেঁয়াজের উৎপাদনও অনেক ভালো হয়। কৃষি অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ২০২০-২০২১ আর্থিক বছরে বাংলাদেশে মোট ১২ লক্ষ কৃষক ২,৫৩,০০০ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছেন এবং অনুমান করা হয়েছে যে মোট ৩৩ লক্ষ ৬২ হাজার মেঃ টন পেঁয়াজ উৎপন্ন হবে যা মোট দেশজ চাহিদার প্রায় ৯০ ভাগ।

৫.১১. উৎপাদন বৃদ্ধিতে দেশীয় কৃষকদের ক্ষতি:

২০১৯ সালের আকাশচুম্বী দামে অনুপ্রাণিত এবং কৃষি বিভাগের উৎসাহে কৃষকরা পেঁয়াজের উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। অনুকূল আবহাওয়ায় ফলনও ভালো হয়। কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই ভারতীয় পেঁয়াজ রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার ফলে বাজারে পেঁয়াজের দাম কমতে শুরু করে। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের শুরুতে যখন দেশীয় পেঁয়াজ বাজারে আসতে শুরু করে তখনও নতুন দেশী পেঁয়াজের দাম ছিলো কেজি প্রতি ৮০ টাকা। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হওয়ায় ইতিমধ্যে ভারত থেকেও প্রচুর সস্তা পেঁয়াজ বাজারে চলে আসে ফলে স্থানীয় পেঁয়াজের দাম স্বাভাবিক হতে শুরু করে, যা মে ২০২০ সাল থেকে ঢাকায় খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ৫০ টাকায় এবং

২০২০ সালের জুন মাসে তা ৩৮-৪০ টাকা/কেজিতে নেমে আসে। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ (DAE) ও কৃষি বিপণন বিভাগের (DAM) সূত্রে জানা যায় যে মার্চ ২০২০-এর শুরুতে কোন কোন প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদনকারী এলাকায় কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি পেঁয়াজের দাম ১৮ থেকে ২৬ টাকায় নেমে আসে অথচ কেজি প্রতি পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ হয়েছে ২২ থেকে ২৬ টাকায় (ঢাকা ট্রাইবিউন মার্চ ২০, ২০২০)। ভারতীয় সস্তা ও নিম্নমানের পেঁয়াজের কারণে বাজারে স্থানীয় পেঁয়াজের ব্যাপক দর পতনে চাষীদেরকে সমূহ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

৬. বিদ্যমান সমস্যা মোকাবেলা:

৬.১. সারা বছরব্যাপী পেঁয়াজ চাষ:

অনেকে বলে থাকেন যে আভ্যন্তরীণ বাজারে পেঁয়াজের ঘাটতি মোকাবেলায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা উচিৎ। এ বিষয়ে কারও দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু পেঁয়াজের বাজার সম্পর্কে যারা অবগত আছেন তারা জানেন যে শীতকালীন মৌসুমে বেশি পেঁয়াজ উৎপাদন করলে বরং কৃষকরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাজারে পেঁয়াজের চাহিদা প্রতি মাসে কম-বেশি প্রায় সমানই থাকে, যার পরিমাণ গড়ে ২ লক্ষ টন। সরবরাহ বেশী হলে বাজারে দাম কমে যাবে ফলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, যা আমরা ২০১৯-২০২০ সালে দেখা যায়। এর ফলে পেঁয়াজ চাষে কৃষকরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে যার পরিণতিতে বাজার ব্যবস্থায় চরম অস্থিরতার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। আবার পেঁয়াজ পঁচনশীল পণ্য বিধায় উৎপাদন বৃদ্ধি করে সারা বছরের জন্য সংরক্ষণ করে বাজার চাহিদা মেটানোও দুরূহ। প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি এই ৪ মাসে দেশে পেঁয়াজের ৮ লক্ষ মেট্রিক টন চাহিদার পুরোটাই বিদেশ হতে আমদানি করে যোগান দেয়া হয়। এই ৮ লক্ষ মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদনের জন্য ৪০০০০ হেক্টর জমিতে (হেক্টর প্রতি ২০ টন) গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে ৩২০ টন বীজ প্রয়োজন। কিন্তু দেশে সরকারি-বেসরকারি সকল উৎসেই গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ অপ্রতুল। ফলে উপ-প্রকল্পের আওতায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের "অঙ্কুর সীড" এর মাধ্যমে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর ধারণায় কৃষক পর্যায়ে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন করার জন্য কর্মকাণ্ড গ্রহণ ও "পেঁয়াজের বীজ সংরক্ষণ প্রযুক্তি হস্তান্তর" বিষয়ক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে, পরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাজার চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন পরিকল্পনা ও সরবরাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক। যেহেতু পেঁয়াজের বাজার চাহিদা সারা বছরই মোটামুটি একই থাকে সেহেতু এক মৌসুমে উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা না করে বছরব্যাপী পেঁয়াজ চাষে কৃষকদেরকে উৎসাহিত ও প্রয়োজনীয় সহায়তা করা দরকার। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) কর্তৃক উদ্ভাবিত গ্রীষ্মকালীন বা খরিপ মৌসুমে চাষ উপযোগী পেঁয়াজ (বারি-২, বারি-৩ ও বারি-৫) চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা। এর ফলে সারা বছর বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ অটুট থাকবে এবং ঘাটতি না থাকায় আমদানিও করতে হবে না। অন্যদিকে একই জমিতে দুইবার পেঁয়াজ উৎপাদন করে কৃষকরাও লাভবান হবেন। সেইসাথে স্থানীয়ভাবে স্বল্প খরচে মাচা পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার স্থাপনে সহযোগিতা করতে পারলে কৃষকরা আরও বেশি লাভবান হবেন।

চিত্র: গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের মাঠ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) ও মসলা গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে কয়েকটি জাতের (বারি-২, বারি-৩ ও বারি-৫) সফল উদ্ভাবন ঘটিয়ে পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টায় প্রমাণিত যে বাংলাদেশে রবি ও খরিপ মৌসুমে (শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা) অর্থাৎ সারা বছর গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষ করা সম্ভব। তবে তারা বিগত ২০০৮ সালে উদ্ভাবন করলেও তা মাঠে সম্প্রসারণ করতে পারে নাই। পিকেএসএফ ২০১৭ সালে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ করে দেশে প্রথম গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষের সম্প্রসারণ শুরু করেছে। এই উন্নত জাতগুলো কিছুটা খরা ও বৃষ্টি সহনশীল এবং এর মধ্যে বারি-৫ পেঁয়াজ এর ফলনও অধিক। কাজেই গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ বৃদ্ধি করে স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরণ করে আমদানি রদ করে রপ্তানি করারও সম্ভাবনা আছে। বাংলাদেশে 'রবি' ও 'খরিপ' মৌসুমে (শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা) তথা সারা বছর গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করতে পারলে এবং উৎপাদনকারীদেরকে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশে ২০১৯ সালের পরিস্থিতি আর কখনও পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকবে না। আগাম চাষের জন্য মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য জুন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বীজতলায় বীজ বপন করতে হবে। খরিপ-২ মৌসুমে চাষের জন্য জুলাই থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে বীজতলায় বীজ বপন করতে হয়। চারার বয়স ৩৫-৪০ দিন হলে মূল জমিতে রোপন করতে হয়।

চিত্র: মেহেরপুর জেলায় গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ

৬.৩ পোঁয়াজের বীজ সংরক্ষণের জন্য কোল্ড রুম স্থাপনঃ

পেঁয়াজ চাষে মানসম্পন্ন বীজের পাশাপাশি আর একটি সমস্যা হলো পেঁয়াজের বীজ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত কোন সংরক্ষণাগার নাই বা অনুপযুক্ত জায়গায় বীজ সংরক্ষণ করা। কৃষকরা তাদেরও উৎপাদিত বীজ প্রথাগত পদ্ধতিতে ঘরে বিভিন্ন পাত্রে বা বস্তায় সংরক্ষণ করে থাকে। এতে বীজের সজীবতা বা প্রানবন্ততা (viability), জীবনীশক্তি (vigour) সময়ের সাথে হ্রাস পেতে থাকে এবং একসময় বীজ মারা যায়। বীজের অঙ্কুরোদগম হয় না বা কম হয়। ফলে কৃষকেদেরও কাছে সংরক্ষণকৃত বীজের অর্ধেকেরও বেশি বীজের অঙ্কুরোদগম হয় না। বাংলাদেশে কোন প্রাইভেট কোম্পানী দেশীয় পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন করে বাজারজাতকরণে এগিয়ে আসে নাই। আর গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ কোন প্রাইভেট কোম্পানী বাজারজাত করছে না। তাই পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহযোগীতায় কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ সংরক্ষণের জন্য ওয়েভ ফাউন্ডেশনের একটি সামাজিক ব্যবসায়িক উদ্যোগ "অঙ্কুর সীড" এর আওতায় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদা উপজেলায় ৫ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কোল্ডরুম

চিত্র: পেঁয়াজের বীজ সংরক্ষণের জন্য কোল্ড রুম

স্থাপন করা হয়েছে। এই কোল্ডরুমে **৬০% আর্দ্রতা ও ৬-১০˚C** তাপমাত্রায় বীজের আদ্রতা ৬±১% সম্পন্ন পেঁয়াজের বীজ সংরক্ষণ করা হয়। এভাবে ১ বছরের জন্য পেঁয়াজের বীজ সংরক্ষণ করা যায়। কোল্ডরুমে সংরক্ষিত পেঁয়াজের বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৯৬% এর বেশি পাওয়া গেছে এবং বীজ হতে উৎপাদিত চারাগুলো সুস্থ সবল, রোগমুক্ত পাওয়া গেছে।

৬.৪ বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ:

মানসম্পন পেঁয়াজ বীজ বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ সহজপ্রাপ্য করার জন্য পিকেএসএফ-এর সহযোগীতায় গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের আবাদ বৃদ্ধিতে প্রকল্পে গুণগত মানের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য ওয়েভ ফাউন্ডেশনের একটি সামাজিক ব্যবসায়িক উদ্যোগ "অঙ্কুর সীড" এর মাধ্যমে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর আদলে কৃষক পর্যায়ে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন করে তাদের নিকট হতে পেঁয়াজের বীজ সংগ্রহ করে কোল্ড স্টোরেজ/চেম্বারে পেঁয়াজের বীজ সংরক্ষণ করে বাজারজাত করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে "অঙ্কুর সীড" এর ব্র্যান্ড ব্যবহার করে প্রায় ১.৫ টন বীজ মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদাহ, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, ভোলা, শরীয়তপুর, দিনাজপুর জেলায় সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে।

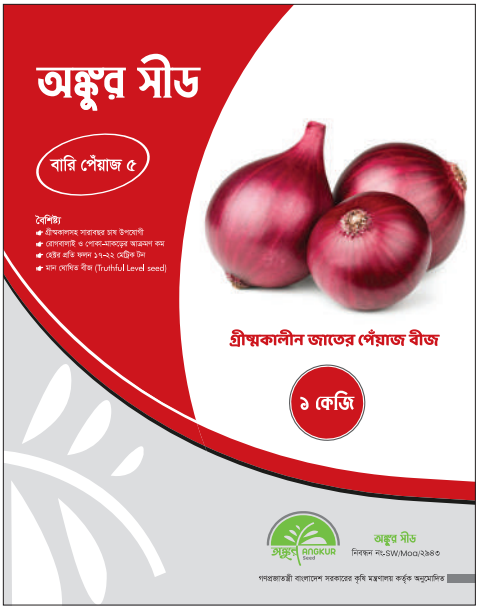

চিত্র: গ্রীষ্মকালীন জাতের পেঁয়াজ বীজ বাজারজাতকরণের প্যাকেট

৭. মাঠ পর্যায়ে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অভিজ্ঞতা:

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর অর্থায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Promoting Agricultural Commercialization And Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা "ওয়েভ ফাউন্ডেশন" ২০১৭ সাল থেকে মেহেরপুর ও পাবনা জেলায় ২২৫০ জন উদ্যোক্তা কৃষকদেরকে নিয়ে "বছরব্যাপী পেঁয়াজ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পরবর্তীতে ২০২১ সাল থেকে সম্প্রাসারিত আকারে চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও রাজশাহী জেলার ৬টি উপজেলায় নতুন করে ১২৫০ জন কৃষককে উক্ত প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়। মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের দ্বারা পরীক্ষামূলক পেঁয়াজ চাষে বারি-৫ জাতের অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া গেছে। হেক্টর প্রতি উৎপাদন প্রায় ১২ মে. টন যা রবি বা শীতকালীন উৎপাদিত জাত (বারি-১ ও ৪ জাত) এর চেয়ে অনেক বেশি। বারি-৫ পেঁয়াজ আগাম চাষের জন্য মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য জুন পর্যন্ত বীজতলায় বীজ বপন করতে হয়। খরিপ-২ মৌসুমে পেঁয়াজ চাষের জন্য জুলাই থেকে আগস্ট মাসে বীজতলায় বীজ বপন করতে হয়। সাধারণত: ৩৫-৪০ দিনের চারা মূল জমিতে রোপণ করতে হয়।

ছক-৪:

মৌসুম	জাত	আবাদের সময়কাল	ফসল সংগ্রহ	বাজারে পাওয়া যায়	ঘাটতির সময়কাল
গ্রীষ্মকালীন খরিপ ১, ২	বারি - ৫	খরিপ-১: মধ্য মার্চ	মধ্য জুলাই	সারা বছর বাজারে পেঁয়াজ পাওয়া যাবে	কোন ঘাটতি থাকবে না বরং উদ্বৃত্ত পেঁয়াজ রপ্তানির সুযোগ থাকবে।
		খরিপ-২: মধ্য জুলাই	মধ্য নভেম্বর		

চিত্র: ইফাদ ও পিকেএসএফ টীমের কার্যক্রম পরিদর্শণ

৭.১. শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের উৎপাদনশীলতার তুলনামূলক চিত্র

পিকেএসএফ উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২২৫০ জন চাষীকে প্রশিক্ষিত করে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ (বারি-৫) চাষ করা হয়। তাদের মধ্য থেকে ২৫ জন কৃষকের উৎপাদন ও লাভের উপর জরিপ করে শীতকালীন (বারি-৪) ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে উৎপাদনশীলতা ও লাভের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো ।

গ্রাফ-২:

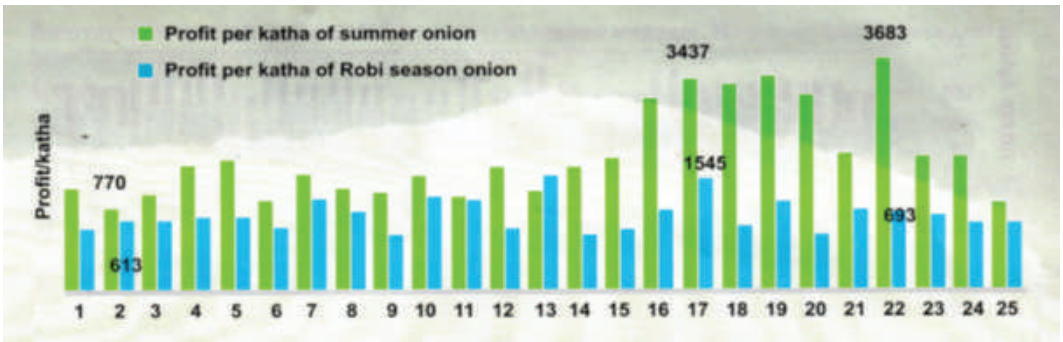

উপরের গ্রাফ চিত্রে ২৫ জন কৃষকের শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের তুলনামুলক ফলাফল তুলে ধরা হলো। চিত্রে দেখা যায় রবি বা শীতকালীন পেঁয়াজ বারি-৪ (সুখসাগর) পেঁয়াজ চাষের চেয়ে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বারি-৫ চাষের ফলন ও লাভ প্রায় কয়েকগুণ বেশি। শীত ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের তুলনামূলক সাফল্য তুলে ধরা হলো। সবচাইতে বেশি সাফল্য পেয়েছেন সোনাপুর গ্রামের দেলোয়ার হোসেন। তিনি রবি বা শীতকালীন পেঁয়াজ বারি-৪ চাষ করে কাঠাপ্রতি ১,৫৪৫ টাকা লাভ করেছেন। অথচ একই জমিতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বারি-৫ আবাদ করে তিনি কাঠাপ্রতি ৩,৪৩৭ টাকা লাভ করেছেন যা প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি। একই গ্রামের জনাব আব্দুল কাদের শীতকালীন পেঁয়াজ বারি-৪ চাষ করে কাঠাপ্রতি লাভ করেছেন ৬৯৩ টাকা। অথচ একই জমিতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বারি-৫ আবাদ করে তিনি কাঠাপ্রতি ৩,৬৮৩ টাকা লাভ করেছেন যা প্রায় সাড়ে পাঁচ গুণেরও বেশি। মানিকনগর গ্রামের তাহমিনা বেগম শীতকালীন পেঁয়াজ বারি-৪ চাষ করে কাঠাপ্রতি সবচেয়ে কম মাত্র ৩৪৮ টাকা লাভ করেছেন। অথচ একই জমিতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বারি-৫

আবাদ করে তিনি কাঠাপ্রতি ১,৯৫৫ টাকা লাভ করেছেন যা প্রায় সাড়ে পাঁচ গুণেরও বেশি। তুলনামুলকভাবে সবচেয়ে কম লাভ করেছেন জয়পুর গ্রামের মোঃ রবিউল ইসলাম। তিনি শীতকালীন পেঁয়াজ বারি-৪ চাষ করে কাঠাপ্রতি লাভ করেছেন ৬১৩ টাকা এবং গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বারি-৫ আবাদ করে তিনি কাঠাপ্রতি ৭৭০ টাকা লাভ করেছেন যা ১.২৬ গুণ বেশি। এখানে উল্লেখ্য যে, জমির উৎপাদনশীলতা অনেকটাই নির্ভর করে চাষের জন্য সঠিক জমি নির্বাচন ও যথাযথ পরিচর্যার উপর। সেই কারণে বিভিন্ন জনের জমিতে কাঠাপ্রতি ফলনও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। তবে এটা সত্য যে শীতকালীন পেঁয়াজের চেয়ে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ অনেক বেশি লাভজনক।

৭.২. গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ খরিপ -১ ও খরিপ-২ মৌসুমের উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র

নিচের টেবিলে গ্রীষ্মকালীন ২টি মৌসুমে (খরিপ-১ ও খরিপ-২) পেঁয়াজ উৎপাদনকারী ২৫ জন কৃষকের উপর জরিপ করে এই ২ মৌসুমের উৎপাদনশীলতা ও লাভের তুলনামূলক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। তথ্য সংগ্রহ করা ২৫ জন কৃষকের মধ্যে ১৫ জন কৃষক পেঁয়াজ আবাদ করেছেন মে মাসে (খরিপ-১) এবং অন্য ১০ জন আবাদ করেছেন আগস্ট মাসে। সব কৃষকই বারি-৫ জাতের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ করেছেন। জরিপে দেখা গেছে যেসব কৃষক আগস্ট বা খরিপ-২ মৌসুমে পেঁয়াজ আবাদ করেছেন তারা মে মাসে তথা খরিপ-১ মৌসুমে আবাদ করা কৃষকদের তুলনায় কাঠাপ্রতি ফলন ও কেজি প্রতি লাভ দুটোই বেশি পেয়েছেন। নিচের টেবিলে তার তুলনামূলক হিসাব দেখানো হলো।

বীজ বপনের মৌসুম	গড় বাজার দর (প্রতি কেজি)	গড় উৎপাদন (প্রতি কাঠা)	কাঠাপ্রতি লাভ (টাকা)
মে মাস (খরিপ-১)	১৮.৮৬ টাকা	১৩৪ কেজি	১,১৪১
আগস্ট মাস (খরিপ-২)	২৫.৮০ টাকা	১৫১ কেজি	২,৫৯৫

*সূত্র: পিকেএসএফ-এর প্রতিবেদন

৭.৩. গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ

সুবিধা:

i. সারা বছর গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের জাতগুলো (যেমন বারি পেঁয়াজ -৫) আবাদ করা যায় (শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে)।
ii. উৎপাদন খরচ (রবি মৌসুমের শীতকালীন পেঁয়াজের তুলনায়) কম বিধায় লাভজনক।
iii. ঘাটতি মৌসুম বিধায় বাজার চাহিদার কারণে সহজে বিক্রয় করা যায়।
iv. ফসল তোলার সাথে সাথে বিক্রয় হয় বলে সংরক্ষণ করার দরকার হয় না।

অসুবিধা সমূহ:

i. বীজ সহজপ্রাপ্য নয়
ii. রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ তুলনামূলকভাবে বেশি।

এসব প্রতিবন্ধকতা নিরসনে পিকেএসএফ এর পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের আবাদ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দেশের বাজারে সারা বছরের জন্য পেঁয়াজের সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চলছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প হতে কৃষকদেরকে উন্নত বীজ সরবরাহ ও আধুনিক চাষাবাদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে প্রতি হেক্টরে গড় উৎপাদন ১৫% থেকে ২০% পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে। গুণগত মানের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সামাজিক ব্যবসা উদ্যোগ "অঙ্কুর সীড" এর মাধ্যমে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর আদলে কৃষক পর্যায়ে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণে "পেঁয়াজের বীজ সংরক্ষণ প্রযুক্তি হস্তান্তর" বিষয়ক কর্মকাণ্ড গ্রহণ

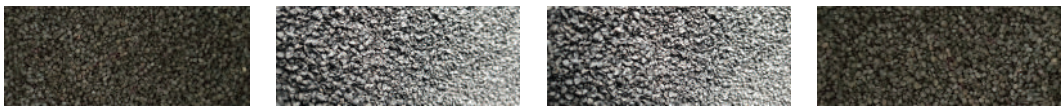

চিত্র: গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ (বারি পেঁয়াজ-৫) এর বীজ

করেছে। কর্মকাণ্ডে "অঙ্কুর সীড" চুক্তিভুক্ত কৃষকদের নিকট হতে পেঁয়াজের বীজ সংগ্রহ করে কোল্ড স্টোরেজ/চেম্বারে পেঁয়াজের বীজ সংরক্ষণ করে প্যাকেজিং করে বাজারজাত করছে। ফলে এর গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের জন্য বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে "অঙ্কুর সীড" প্রতি বছর সিড মাল্টিপ্লিকেশন-এর মাধ্যমে মানসম্পন্ন গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজের সরবরাহ বৃদ্ধিতে কাজ করবে বলে আশা করা যায়।

চিত্র: প্যাকেটজাত গ্রীষ্মকালীন বীজ

৭.৪. পেঁয়াজ সংগ্রহত্তোর ওজন হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা:

পেঁয়াজ রসালো বাল্বজাতীয় উদ্ভিদ হওয়ায় গুদামজাত অবস্থায় এর ওজন কমে যায়। শীতকালীন পেঁয়াজ বারি-৪ জাতের ফসল সংগ্রহের সময় (মার্চ-এপ্রিল) বাজার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম থাকে, এক্ষেত্রে পেঁয়াজের ওজন হ্রাস কমানো, পঁচন রোধ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৃষক পর্যায়ে স্বল্প খরচে বাশেঁর মাচা পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার স্থাপনে সহযোগিতা করা জরুরি। এতে ফসল সংগ্রহের সময় কৃষকরা কম দামে পেঁয়াজ বিক্রি না করে ৫/৬ মাস পরে ভালো দামে বিক্রি করতে পারবে। তা ছাড়াও ওজন হ্রাস জনিত ক্ষতি থেকেও কিছুটা রক্ষা পাবে।

পিকেএসএফ-এর মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, ১০ ফুট বাই ২০ ফুট আকারের সংরক্ষণাগারে ১৫০-২০০ মণ পেঁয়াজ সংরক্ষণে প্রতি মৌসুমে কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা লাভ হয়। প্রতিটি সংরক্ষণাগার স্থাপনে ২০-২৫ হাজার টাকা ব্যয় হয় যা লাভের তুলনায় খুবই কম। ফলে কৃষকদের কাছে এই ধরণের সংরক্ষণাগার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বছরব্যাপী পেঁয়াজ চাষ বিষয়ক উপ-প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর জেলায় ১৩৭ টি Ambient প্রযুক্তির স্বল্পমূল্যের পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার প্রর্দশনী স্থাপন করেছে। এটি লাভজনক হওয়ায় বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের নিজ উদ্যোগে শতাধিক পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার স্থাপন করা করেছে ও ভবিষ্যতে আরও হবে আশা করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, এই প্রযুক্তি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: মঞ্জুর হোসেন উদ্ভাবন করেন।

চিত্র: ব্যয় সাশ্রয়ী প্রাকৃতিক (Ambient প্রযুক্তি) পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার

৮. বছরব্যাপী পেঁয়াজ চাষ সম্প্রসারণে পিকেএসএফ-এর যুগান্তকারী অবদান

ক. আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD)-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত Promoting Agricultural Commercialization And Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা "ওয়েভ ফাউন্ডেশন" এর মাধ্যমে ২০১৭ সাল থেকে মেহেরপুর ও পাবনা জেলায় ২২৫০ জন উদ্যোক্তার মাঝে "বছরব্যাপী পেঁয়াজ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। পরবর্তীতে ২০২১ সাল থেকে সম্প্রাসারিত আকারে চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও রাজশাহী জেলার ৬টি উপজেলায় নতুন করে ১২৫০ জন কৃষককে উক্ত প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়। মসলা গবেষণা কেন্দ্র ২০০৮ সালে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ (বারি-৫) উদ্ভাবন করলেও কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণে তেমন সাফল্য পায় নাই। পিকেএসএফ ২০১৭ সালে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ করে এবং সফলভাবে দেশের বিভিন্ন জেলায় সম্প্রসারণ করছে। নিম্নে বর্নিত তিনটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উক্ত কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

i. গুণগত মানের বীজ ও চারা সহজপ্রাপ্য করে সারা বছর পেঁয়াজ চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
ii. কৃষক পর্যায়ে ব্যয় সাশ্রয়ী বাণিজ্যিক সংরক্ষণাগার গড়ে তুলে পেঁয়াজের সংগ্রহোত্তর অপচয় ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা।
iii. বছরব্যাপী পেঁয়াজ চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে প্রকল্প এলাকায় মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

খ. প্রাক প্রকল্পকালীন অবস্থা:

i. কৃষকরা রবি মৌসুমে বা শীতকালে পেঁয়াজ চাষ করলেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আধুনিক পদ্ধতি ও দেশীয় উচ্চ ফলনশীল জাত চাষে অভ্যস্ত ছিল না।
ii. উন্নত জাত নির্বাচন, উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন মৌসুম বিষয়ে সচেতনতা, বীজতলা প্রস্তুত, কিউরিং, সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম, শস্য সংরক্ষণ, আয়-ব্যয়ের হিসাব, শস্যক্রম, ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি এবং সচেতনতার অভাব ছিল।

iii. গুণগতমাণসম্পন্ন উচ্চফলনশীল জাতের ভাল বীজ ও চারার সরবরাহের ঘাটতি এবং কৃষকদের বীজ উৎপাদনের দক্ষতা না থাকায় পেঁয়াজের উৎপাদন কম হতো। এ ছাড়াও উচ্চফলনশীল নতুন জাতের পেঁয়াজ উৎপাদনের কৌশল সম্পর্কে দক্ষতা কম থাকায় নতুন পণ্য গ্রহণে কৃষকদের অনীহা ছিল।

iv. সাধারণত: চাষীরা পেঁয়াজের বীজ ছিটিয়ে বপন করতো, ফলে বীজ বেশি লাগতো। নতুন প্রযুক্তি যেমন- চারা উৎপাদন ও সারিতে চারা রোপনের সুফল সম্পর্কে ধারণা ও আগ্রহ দুটোই কম ছিল।

v. সারা বছর পেঁয়াজ চাষের সুযোগ থাকলেও প্রয়োজনীয় দক্ষতা, সহযোগিতা ও গুণগত মানের বীজের অভাবে কৃষকরা তা করতে পারে নি।

vi. বছরব্যাপী পেঁয়াজ চাষ অধিক লাভজনক কিন্তু এর উৎপাদন ব্যয় বেশি। কিছুদিন সংরক্ষণ করতে পারলে পেঁয়াজের মূল্য বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু কৃষকদের আর্থিক সক্ষমতা ও সংরক্ষণাগার না থাকায় ফসল ঘরে তোলার সাথে সাথে কমমূল্যে বিক্রি করে দেয়া হতো। তাই কৃষকদের জন্য কম মূল্যের সংরক্ষণাগারসহ প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের আবশ্যকতা ছিল।

vii. সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব এবং দূর্বল মার্কেট লিংকেজ এর কারণে কৃষক পেঁয়াজ উৎপাদনে ও বাজারজাতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সুফল লাভ করতে পারে নি।

viii. পেঁয়াজ চাষ কার্যক্রমে মৌলিক সেবাদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের (উপকরণ সরবরাহকারী, কারিগরি ও আর্থিক সেবা প্রদানকারী ও বাজারজাতকারী) সাথে যথাযথ সম্পর্কের অভাবে প্রয়োজনীয় সেবা থেকে পেঁয়াজ চাষীরা বঞ্চিত ছিল। এছাড়াও ডিলার, সরবরাহকারী, সেচ সেবাদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ব-স্ব কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সক্ষমতার অভাব ছিল।

চিত্র: গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের মাঠ

গ. পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচি

উপরোক্ত সমস্যা সমূহ সমাধানে এবং বছরব্যাপী পেঁয়াজ চাষে কৃষকদেরকে উৎসাহিতকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

i. উচ্চ ফলনশীল পেঁয়াজ চাষ পদ্ধতি, জৈব সার উৎপাদন ও প্রয়োগ এবং রোগ-বালাই দমনের উপর ৩,৫০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ii. আবাদ মৌসুমে ভালো বীজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৭৫০ জন কৃষককে পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

iii. ১,৫০০ জন পেঁয়াজ চাষী ব্যবসা পরিচালনা, বিপণন ও বাজার তথ্যের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

iv. ২৫ জন উপকরণ সরবরাহকারী, সেচ কমিটির সদস্য, ডিলারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

v. ৩৫০ টি পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

vi. আংশিক অনুদানে উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রতিটিতে ১৫০ মণ থেকে ২৫০ মণ পর্যন্ত পেঁয়াজ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মোট ১৩৭ টি পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার স্থাপন করা হয়েছে।

vii. অর্জিত নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারণে প্রকল্পভুক্ত কৃষককে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

viii. উচ্চ ফলনশীল পেঁয়াজ চাষ পদ্ধতি ও সাফল্য সবার কাছে পৌঁছানোর জন্য উপজেলা পর্যায়ে কৃষি মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় এ প্রকল্পের সাফল্য নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

ix. বছরব্যাপী পেঁয়াজ উৎপাদনের উপর লিফলেট ছাপানো ও বিতরণ করা হয়েছে।

x. পেঁয়াজের বীজ সংরক্ষণের জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলায় একটি কোল্ডরুম স্থাপন করা হয়েছে।

ঘ. ফলাফল (সংক্ষিপ্তাকারে)

পিকেএসএফ-এর Promoting Agricultural Commercialization And Enterprises (PACE) প্রকল্পের অধীনে "বছরব্যাপী পেঁয়াজ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের প্রারম্ভিক সমীক্ষা ও সমাপনী সমীক্ষা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য ফলাফল ও বর্তমান অবস্থা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সূচক/লক্ষ্যমাত্রা (মূল লগফ্রেম অনুযায়ী)	প্রারম্ভিক সমীক্ষা প্রতিবেদন (জুন ২০১৭)	সমাপনী সমীক্ষা প্রতিবেদন (জুলাই ২০২১) ও মাঠ পর্যায়ের তথ্য
৬০% প্রকল্পভুক্ত চাষী গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ করছে।	১ জন চাষী গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ করে	২০১৮ সালে ১৪১ জন, ২০১৯ সালে ৫৩৪ জন ২০২০ সালে ১৫০০ জন ২০২১ সালে ২০১২ জন
গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের জমির আওতা ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে	২.৮৪ একর	৮০.০৫ একর
পেঁয়াজের উৎপাদন ব্যয় ৩০% কমেছে (১ বিঘা = ৩৩ শতক)	৪২,২৯০/- টাকা/বিঘা	৩২,৪৮৩/- টাকা/ বিঘা (পেঁয়াজের উৎপাদন ব্যয় ২৩% কমেছে)
প্রকল্পভুক্ত উদ্যোক্তাদের গড় মুনাফা ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে।	বাৎসরিক গড় মুনাফা ১০% ছিল	বাৎসরিক গড় মুনাফা ৫২% বৃদ্ধি পেয়েছে

এছাড়া:

i. প্রশিক্ষিত অগ্রসর কৃষকগণের ব্যবসা পরিচালনা ও বাজারজাত সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

ii. এতদ্‌সংক্রান্ত ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ৫টি কৃষি সাব সেক্টরের এ্যাক্টরগণ (যেমন-উপকরণ সরবরাহকারী, উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী, খুচরা বিক্রেতা ও সেবা প্রদানকারী) পরস্পরের সহায়ক শক্তি হিসাবে সম্মিলিতভাবে কাজ করছে।

iii. ব্যয় সাশ্রয়ী প্রাকৃতিক (Ambient প্রযুক্তির) সংরক্ষণাগার স্থাপনের ফলে পেঁয়াজের সংগ্রহোত্তর অপচয় কমে যাওয়ায় এবং পেঁয়াজ বর্ধিত দামে বিক্রি করতে পারায় কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন।

iv. স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল উন্নত জাতের বারি পেঁয়াজ-৫ জাতের পেঁয়াজ বীজের প্রাপ্যতা কৃষক পর্যায়ে নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষিত কৃষকদের উৎপাদিত পেঁয়াজের বীজের জন্য প্রতিবেশি এলাকাসমূহে চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে প্রশিক্ষিত কৃষকদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেক কৃষক একই পদ্ধতি অনুসরণ করে পেঁয়াজ চাষাবাদ ও বাজারজাত করছে।

চিত্র: গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের মাঠ

ছক-৫: প্রকল্পের আওতায় উৎপাদন তথ্যচিত্র

বিবরণ	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর
পেঁয়াজ বীজ সংগ্রহ	৬ কেজি	৫০ কেজি	৬০ কেজি	৩০০ কেজি	১০০০ কেজি
কন্দ সংগ্রহ ও উৎপাদন	৩,২০০ কেজি	৪,৮০০ কেজি	৮,০০০ কেজি	২৫০০০ কেজি	২৫০০০ কেজি
পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন	৪০০ কেজি	৬০০ কেজি	১,০০০ কেজি	২০০০ কেজি	২৭০০ কেজি
গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন (বারি-৫)	৮.৬ বিঘায় ৫৭১ মণ	২৯.৪ বিঘায় ১,৯৯৫ মণ	১১৪.২৫ বিঘায় ৮,০০৬ মণ	২২৫ বিঘায় ১৩,৫০০ মণ	২৫০ বিঘায় ২৫,০০০ মণ

৯. সুপারিশসমূহ:

বিভিন্ন গবেষণা নিবন্ধ, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এবং পিকেএসএফ এর প্রায় ৫ বছরের মাঠ পর্যায়ে পেঁয়াজ চাষীদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে একথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, পেঁয়াজ চাষ একটি অত্যন্ত লাভজনক উদ্যোগ যা গ্রামীণ জনগণের জন্য আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তবে সমাধানযোগ্য কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমাধান হিসাবে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিস্থিতি, বাজার চাহিদা, সরবরাহ ও ঘাটতি জনিত সংকট মোকাবেলায় বছরব্যাপী পেঁয়াজ চাষের সম্ভাবনা বিবেচনায় করণীয় সম্পর্কে পিকেএসএফ-এর মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে ইতোমধ্যে উপরের অধ্যায়গুলোতে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তাকারে ভবিষ্যতে করণীয় তুলে ধরা হলো:-

৯.১. পরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করা:

পেঁয়াজ একটি বাল্বজাতীয় পঁচনশীল পণ্য। অত্যাধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকার কারণে এককালীন (রবি মৌসুমে) অধিক উৎপাদন কৃষকেদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীন বাজার চাহিদা অনুসারে পরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থার আওতায় বছরব্যাপী পেঁয়াজ চাষে কৃষকদের প্রশিক্ষিত করাসহ সংরক্ষণ সুবিধা সরবরাহ করার মাধ্যমে তাদেরকে সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। কোন মৌসুমে চাহিদার বেশি পেঁয়াজ উৎপাদিত হলে তা রপ্তানি করার জন্য সম্ভাব্য সুযোগ তৈরি করতে হবে।

৯.২. পিকেএসএফ-এর মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ:

বছরব্যাপী পেঁয়াজ চাষে পিকেএসএফ-এর মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতাকে অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণের মাধ্যমে তাদেরকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখিত সীমাবদ্ধতাসমূহ যেমন উচ্চ ফলনশীল

i. দক্ষতার বিকাশ: প্রশিক্ষিত কৃষকদের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে অন্যান্য কৃষকদেরকে হাতেকলমে প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষিত কর্মীগণ সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করতে পারে।
ii. পেঁয়াজের বীজের উৎপাদন বৃদ্ধি করা: উচ্চ ফলনশীল গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ (বারি-৫) কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদিত বীজকে মোড়কজাত করে বাজারজাতকরণে সম্প্রসারণ করা।
iii. স্বল্প খরচে পেঁয়াজ সংরক্ষণের ব্যবস্থাগত কারিগরি জ্ঞান সকল কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ করতে হবে।
iv. পেঁয়াজ চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ, সেবা ও সহযোগিতা প্রাপ্তি কৃষকদের জন্য সহজসাধ্য করতে হবে।
v. ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সামাজিক ব্যবসা উদ্যোগ "অঙ্কুর সীড" এর মাধ্যমে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর আদলে কৃষক পর্যায়ে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করা।

চিত্র: গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন

৯.৩. উচ্চ ফলনশীল বড় আকৃতির (বারি-৪) পেঁয়াজ চাষ সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ:

প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুরে উৎপাদিত উচ্চ ফলনশীল বড় আকৃতির (বারি-৪) পেঁয়াজ তুলনামূলকভাবে কম দামের হওয়ায় এবং সুস্বাদু হওয়ায় হোটেল-রেষ্টুরেন্টে আপামর ভোক্তার কাছে এ পেঁয়াজ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। দেখতে একই রকম বিধায় অনেকে এই পেঁয়াজকে আমদানিকৃত ভারতীয় পেঁয়াজ বলে ভুল করে থাকেন। কাজেই বাংলাদেশে উৎপাদিত এই পেঁয়াজকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে পারলে কৃষকগণ লাভবান হবেন।

৯.৪. স্থানীয় প্রযুক্তির পেঁয়াজ সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও মৌসুমী ঋণের ব্যবস্থা করা:

স্বল্প ব্যয়ে পেঁয়াজ সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে সহযোগিতা করা, যাতে করে ফসল তোলার মৌসুমে কৃষকরা কম দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য না হন। এক্ষেত্রে সংস্থার সাথে আলোচনা করে বর্ণিত সমস্যা সমাধানে সহজ শর্তে পেঁয়াজ চাষীদের ঋণ প্রদানের পাশাপাশি Ambient প্রযুক্তির স্বল্পমূল্যের পেঁয়াজ সংরক্ষণাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, যাতে সুবিধাজনক সময়ে পেঁয়াজ বিক্রির অর্থ দ্বারা ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা যায়।

৯.৫. পেঁয়াজ ভিত্তিক শস্য বিন্যাস বিকশিত করা:

অধিক উৎপাদনশীল অঞ্চলে পেঁয়াজ ভিত্তিক শস্য বিন্যাসের প্রচলন করা যেতে পারে।

৯.৬. প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সহযোগিতা সমূহ সহজলভ্য করা:

পেঁয়াজ চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সহযোগিতাসমূহ প্রাপ্তি কৃষকদের জন্য সহজলভ্য করা। এক্ষেত্রে মেহেরপুর জেলার কৃষকদের সাথে উপকরণ সরবরাহকারী, সেচ কমিটির সদস্য ও ডিলারদের সম্মিলিত ভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতাকে অন্য জেলায় কাজে লাগানো যেতে পারে।

৯.৭. আমদানি নিয়ন্ত্রণ:

বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে ফসল তোলার সময় বিশেষ করে মার্চ-এপ্রিল মাসে ভারতীয় নিম্নমানের সস্তা পেঁয়াজ আমদানি করার ফলে দেশীয় কৃষক তাদের উৎপাদিত পেঁয়াজের সঠিক মূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমনকি গত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরসহ বিভিন্ন সময় কৃষক তাদের উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামে পেঁয়াজ বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। কাজেই স্থানীয় পেঁয়াজ বাজারজাত করার সময় আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলকে সচেতন করতে পলিসি ডায়লগের আয়োজন করা যেতে পারে।

১০. উপসংহার

পেঁয়াজ একটি বহুল ব্যবহৃত অতি প্রয়োজনীয় অর্থকরী কৃষিপণ্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত ব্যবহারের ফলে এর চাহিদাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে সারা বিশ্বে পেঁয়াজের উৎপাদনও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থাপনা ও কৃষকদের জন্য যথাযথ সহযোগিতার অভাবে এই অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদনকারীগণ তাদের প্রাপ্য লাভ থেকে বঞ্চিত থাকেন। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে হয়তো একদিন পেঁয়াজ চাষে কৃষকরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে যার পরিণতিতে বাজার ব্যবস্থায় অস্থিরতার পুনরাবৃত্তি ঘটার পাশাপাশি পেঁয়াজের মত একটি পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার ঘাটতি দেখা দিবে, যা জনসাধারণের জন্য সুখকর হবে না।

তাই পিকেএসএফ এর উদ্যোগে মেহেরপুর জেলায় বছরব্যাপী পেঁয়াজ চাষ সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন, ফসল সংগ্রহোত্তোর সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, জৈব সার প্রয়োগ ও আধুনিক চাষাবাদ প্রক্রিয়ার প্রচলনের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার সাফল্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। অর্জিত সাফল্য হতে প্রাপ্ত শিখন কাজে লাগানোর মাধ্যমে সারাদেশের সম্ভাবনাময় জেলাসমূহে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ ও Ambient প্রযুক্তির স্বল্পমূল্যের পেঁয়াজ সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশে পেঁয়াজের কোন ঘাটতি তো থাকবেই না বরং উদ্বৃত্ত রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
২২/১৩বি, ব্লক-বি, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন ও ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৫৮১৫১৬২০, +৮৮ ০২ ৪৮১১০১০৩
Email: info@wavefoundationbd.org
Website: www.wavefoundationbd.org